

এ কে এম শাহনাওয়াজ

বইয়ের সঙ্গে বাড়ছে নতুন প্রজন্মের দূরত্ব

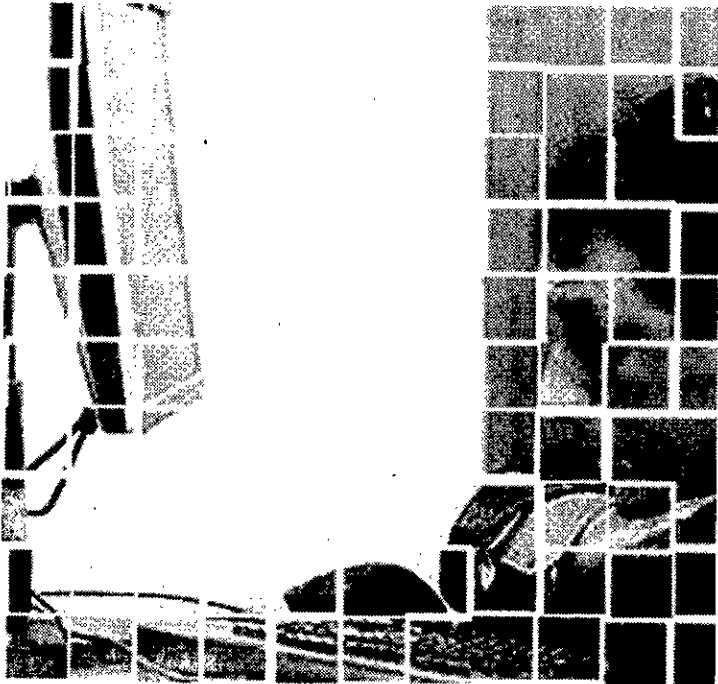
ছেলেবেলায় স্কুলে বিজ্ঞান নিয়ে রচনা লিখতে গিয়ে এই মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে প্রায় সবাই শুরু করতাম যে, 'বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ আর কেড়ে নিয়েছে আবেগ।' বড় হয়ে এ কথার তাৎপর্য খুঁজতাম। মাঝেমাঝে মনে হতো কথটির মধ্যে যুক্তি আছে আবার বড় একপেশে মন্তব্যও মনে হতো। আমি অনেকদিন থেকে একটি গল্প গ্রাম খুঁজে বেড়াচ্ছি। এখনও কেউ সন্ধান দিতে পারেনি। যে গ্রামে বড় সংখ্যক মানুষ যাতায়াতের অব্যবহার কারণে রাজধানী দূরের কথা, নিজ জেলা শহরে কখনও আসেনি। বিদ্যুতের দেখা পায়নি। সন্ধ্যার পর হারিকেন-কুপির টিমটিমে আলোতে সন্ধ্যার অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করে। রাত ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে নিঝুম হয়ে যায় গ্রাম। শহর থেকে কোনো আত্মীয় দৈবাৎ বেড়াতে গেলে যারা মনে করে অন্য গ্রামের মানুষ। পাড়া ভেঙে মানুষ দলে দলে একনজর দেখতে আসে। দূরের আত্মীয় হলেও একবেলা অন্তত পিঠে খাওয়াতে না পারলে যেন কারও স্বস্তি নেই। আর বিনায়ের দিনে করুণ ছবি। সবার মুখ ভার। পুরো গ্রামের বৌ-বি, ছেলেবুড়ো বিদায় জানাতে গ্রামের শেষ মাথা পর্যন্ত চলে আসত। এসব গ্রামে তখনও বিজ্ঞানের কোনো সুবিধা প্রবেশ করেনি। পাশাপাশি আবেগ ছিল বুকভরা। আর সে আবেগের পুরো ছোঁয়াই তখন পাওয়া যেত। আমার ছেলেবেলার এমন দুটো গ্রামের কথা এখনও মনে পড়ে। একটি আমার নানা বাড়ি বিক্রমপুরের ভাগ্যকুলের উত্তর বালাসুর গ্রাম। আর অন্যটি বড় বোনের স্বস্তরবাড়ি শরীয়তপুরের নড়িয়া থানার শাওড়া গ্রাম। আমার ছেলেবেলায় অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে আরও অনেক গ্রামের মতোই এ দুটি গ্রাম বিজ্ঞানের সুবিধাবঞ্চিত ছিল। আর তাই বোধহয় প্রচণ্ডভাবে অনুভব করতাম প্রাণের টান।

এখন রাতারাতি হয়ে যাওয়ায় আর যানবাহনের সুবিধা বাড়ায় দু-আড়াই ঘণ্টা গাড়ি চালিয়েই নারায়ণগঞ্জ থেকে নানাবাড়ি যেতে পারি। আর শাওড়ায় আড়াই-তিন ঘণ্টায়। আজ এসব গ্রামে যেতে সড়কপথ তৈরি হয়েছে। বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। রেডিও, টেলিভিশন আর ফ্রিজ চলছে। সড়ক ব্যবস্থাপনা না থাকায় গ্রাম তখন ছিল অনেক দূর। মনে পড়ে নারায়ণগঞ্জ ঘাট থেকে বিকাল বেলায় রকেট স্টিমার ছাড়া। নাম ছিল 'গোয়ালন্দ মেল'। মাঝরাতে ভাগ্যকুল ঘাটে ভিড়ত। এখান থেকে অতদূর দেড় কিলোমিটার দূরে উত্তর বালাসুর গ্রাম। দেখতাম আমাদের এগিয়ে নেয়ার জন্য ঘাট পর্যন্ত চলে আসত গ্রামের কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫ জন ছেলেবুড়ো। বিদায়ের সময়টিও প্রায় একই রকম। আজ এ গ্রামগুলোয় আত্মীয়-পরিজন আছেন ঠিকই। আদর-আপ্যায়ন সাধ্যমতো করেনও; কিন্তু সেই আবেগের আর খোঁজ পাওয়া যায় না। শহরের যান্ত্রিকতা তাদেরও গ্রাস করেছে।

ছেলেবেলায় দেখতাম স্কুলে এবং পরিবারের ভেতরে ক্লাসের পড়াশোনার পাশাপাশি পাঠ্যভ্যাস গড়ে তোলার প্রগোদনা থাকত। গ্রামে বা মহানগর পাঠ্যগার গড়ে তোলা হতো। বন্ধুদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল কে কটা বই পড়তাম তা নিয়ে। আমাদের হাতে বিজ্ঞানের অনেক আশীর্বাদই এসে তখনও পৌঁছেনি। ফলে সময় কাটাতে স্কুলের বাইরে খেলাধুলা আর বইপড়া বিনোদনের অংশই পরিণত হতে লাগল। স্বাধীনতা-উত্তরকালে রেডিওর পাশাপাশি বিটিভি কিছুটা বিনোদনের উৎস ছিল। তবে তা বইপড়ার অভ্যাস ও সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার তেমন বিদ্য ঘটায়নি। বরং বলা যায়, সাংস্কৃতিক আবহকে কিছুটা প্রগোদনাই দিয়েছে। একশ শতকের শুরুর দিকে আমরা আকাশসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছলাম। দিনে দিনে অনেক টিভি চ্যানেল হল। প্রাইভেট অনেক রেডিও সম্প্রচার শুরু করল। চ্যানেলের কল্যাণে হিন্দি সিরিয়াল আর হিন্দি ছবি তরুণ প্রজন্মকে অনেকটাই বন্দি করে ফেলল। তখন এদের একটি বড় অংশ পরীক্ষাকেন্দ্রিক প্রস্তুতি ছাড়া বই পাঠ আর

নন্দনচর্চায় খুব একটা সময় বের করতে পারতাম না। এবার দাবানলের মতো প্রবেশ করল ফেসবুক, টুইটার জাতীয় আধুনিক সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম। এখন নতুন প্রজন্ম স্কুল-কলেজের দায় কিছুটা মেটাতে পারলেও ফেসবুক গ্রাসে তারা অনেকটাই বিপর্যস্ত। ক্লাসে অমনোযোগিতা বেড়েছে। টের পাই পেছনের দিকে বসা ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই স্মার্টফোনের বাটন টিপছে। অনেক মা-বাবাকে দেখি শিশুসন্তানটিকে ট্যাব কিনে দিয়ে ট্যাবাসক্ত করে দিয়েছেন। এদের সুস্থভাবে

যাবে? আমার মনে হয় না। আকাশসংস্কৃতি আর ফেসবুক-টুইটার সংস্কৃতির ভেতর অবগাহন করতে গিয়ে অনেকের কাছে বইপড়া উপদ্রব ধরনের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এখন তরুণদের অনেকেই কানে হেডফোন আর হাতের মোবাইল সেটে অনবরত আঙুলের ছন্দময় দোলা। বইপড়ার সময় কোথায় ওদের? ভোরবেলা হাঁটিতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে ছাত্রছাত্রীদের ভিড় দেখে নতুনভাবে আশাবাদী হয়েছিলাম। তাহলে নিম্নদুকের মুখে ছাই দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা কি আবার লাইব্রেরিমুখী হতে শুরু করেছে!



কলকাতা বইমেলায় চেয়ে একুশের গ্রন্থমেলায় চরিত্র এবং আবেগ আলাদা। একুশের গ্রন্থমেলা অনেক বেশি গোছাল। বই প্রকাশ নিয়ে প্রকাশকদের পরিমার্জনাও একটু আলাদা। অনেক বছর ধরেই মেলায় আসা মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। জায়গা সংকুলান না হওয়ায় গ্রন্থমেলায় বড় অংশ এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। আকর্ষণীয় স্টল সাজিয়ে বসেছেন প্রকাশকরা। একজন প্রকাশক আক্ষেপ করে বলেছিলেন, যত মানুষ প্রতিদিন মেলায় আসেন, তাদের দশ ভাগও যদি বই কিনতেন তাহলে মেলায় চেহারাটাই পাল্টে যেত।

বেড়ে ওঠা নিয়ে আমার শংকা হয়। আর বই পড়ায় মনোযোগী করে তোলা তো হবে সাধনার ব্যাপার। আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীদের আমরা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত অতৃত-জীবন উপহার দিয়েছি। ওদের কারও মুক্তচিন্তা করার মতো জীবন নেই। পাঠক্রমবহির্ভূত পাচটি বইয়ের খোঁজ রাখার সময় ওদের নেই। ক্লাস, কোচিং আর পরীক্ষা—এ তিনে আটকে গেছে জীবন। জিপিএ-৫ অর্জন ছাড়া ভবিষ্যতের আর কোনো স্বপ্ন নেই। শহরকেন্দ্রিক হাতেগোনা কয়েকটি কলেজ ছাড়া অধিকাংশ কলেজে শিক্ষক মনে করেন না রেগুলার কলেজে যেতে হয়। আর গেলেও ক্লাস নিতে হয়। অন্যদিকে শিক্ষার্থী মনে করে শিক্ষক নির্দেশিত নোট-গাইডবই সংগ্রহ করার বাইরে ক্লাসে যাওয়ার খুব একটা আবশ্যকতা নেই। ফলে ক্লাসের বই বলতে যারা গাইডবই বোঝে, তাদের কাছে পাঠবহির্ভূত বইয়ের খোঁজ রাখা বাতুলতা মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়কে কি এ অবস্থা থেকে দূরে রাখা

খোঁজ করে জানলাম বিষয়টা তেমন নয়। এখন লাইব্রেরিতে আসন পাওয়া ভার। বিসিএস বা অন্য কোনো চাকরিপ্রত্যাশীরা নিজেদের প্রস্তুত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বেলায় এসে লাইব্রেরিতে যাচ্ছে। ভাগ্যিস স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এখন আর তেমন লাইব্রেরিতে যাওয়ার সময় পায় না। নয় তো লাইব্রেরিতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় জন্য এতদিনে আন্দোলন শুরু করে দিত। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক বন্ধুরা এখন একই আক্ষেপ করে বলেন, ফেসবুক সংস্কৃতি জ্ঞানচর্চার জায়গা থেকে তরুণদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এর প্রামাণ্য উদাহরণ পেলাম এবার কলকাতা বইমেলায় গিয়ে। ২৬ জানুয়ারি কলকাতায় শুরু হয়েছে বইমেলা। আমি ২৭ জানুয়ারি বিকাল বেলা মেলায় গিয়েছি। কলকাতা বইমেলায় অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। আগে যখন ময়দানে বইমেলা হতো, তখন অনেকবারই আমি বইমেলায় গিয়েছি। এখনকার তুলনায় ময়দানের বইমেলা অনেক

বেশি জাঁকালো ছিল। দীর্ঘ লাইন ধরে টিকিট কেটে মেলায় ঢুকতে হতো। আমি গত শতকের ৯০-এর দশকের কথা বলছি। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে একটি স্মৃতিকথা অনেক লেখায় লেখেছি। বলেছি লাখ লাখ বইপ্রেমিক মানুষকে দেখেছি যাদের অধিকাংশই হাতভরা বই কিনে বাড়ি ফিরেছে। তখন আক্ষোসাস করে বলতাম, আহা! আমাদের একুশের গ্রন্থমেলায় দর্শকদের অধিকতর যদি বই কিনত, তাহলে আমাদের প্রকাশনার চেহারাটাই পাল্টে যেত। এবার দেখলাম যেন একই হাওয়া বইছে দুই বাংলায়। কলকাতা বইমেলা চলে গেছে এখন স্টলকে। বড় বড় প্যাভিলিয়ন এখন খুব কমই চোখে পড়ল। বাংলাদেশের প্রায় ত্রিশটি প্রকাশনা সংস্থার স্টল ঘিরে একটি আলাদা প্যাভিলিয়ন করা হয়েছে। কান্তজীর মন্দিরের আদলে করা এ প্যাভিলিয়নটিকেই একমাত্র আকর্ষণীয় মনে হয়েছে আমার। কলকাতা বইমেলায় এখন আর টিকিট কাটতে হয় না। তেমন কিউ দিয়েও আমাদের ভেতরে ঢুকতে হল না। বই ছাড়াও সেখানে রয়েছে নানা রকম খাবারের দোকান। তাঁত বস্ত্রের দোকান, আচার-চাটনির দোকান। বইয়ের দোকানের চেয়ে এখানে এসব দোকানেই ভিড় তুলনামূলকভাবে বেশি। মেলা থেকে বই কিনে বাড়ি ফেরা মানুষের সংখ্যাও বেশ কমে গেছে। আমার সঙ্গে মেলায় যোগ দিয়েছিলেন বারাসাত কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ও লেখক রাজকুমার চক্রবর্তী। তিনিও অভিন্ন হতাশা ব্যক্ত করলেন। আসলে 'অবসরে বইপড়া' বলে একটি কথা ছিল। এখন তো ফেসবুক, টুইটার আর আকাশসংস্কৃতির চাপে অবসর বলে কোনো কিছু নেই। তাই অবসরে বইপড়া ক্রমেই নতুন প্রজন্মের কাছে অচেনা হয়ে পড়ছে। আমি দেখেছি, অনুভব করেছি কলকাতা বইমেলায় চেয়ে একুশের গ্রন্থমেলায় চরিত্র এবং আবেগ আলাদা। একুশের গ্রন্থমেলা অনেক বেশি গোছাল। বই প্রকাশ নিয়ে প্রকাশকদের পরিমার্জনাও একটু আলাদা। অনেক বছর ধরেই মেলায় আসা মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। জায়গা সংকুলান না হওয়ায় গ্রন্থমেলায় বড় অংশ এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। আকর্ষণীয় স্টল সাজিয়ে বসেছেন প্রকাশকরা। একজন প্রকাশক আক্ষেপ করে বলেছিলেন, যত মানুষ প্রতিদিন মেলায় আসেন, তাদের দশ ভাগও যদি বই কিনতেন তাহলে মেলায় চেহারাটাই পাল্টে যেত। এদেশে নানা নীতিনির্ধারণী খেলায় বিভ্রান্ত আমরা আসলে নতুন প্রজন্মকে বইমুখী করে তুলতে পারছি না। আমি দেশের অন্যতম নামি এক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করি। ক্লাসে খোঁজ নিয়ে জেনেছি কমপক্ষে ৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী একুশের গ্রন্থমেলা সম্পর্কে তেমন পরিচয় কিছু জানে না। তারা জানে না কোথায় বসে একুশের গ্রন্থমেলা। প্রায় ৪০ ভাগ ছাত্রছাত্রী কখনও গ্রন্থমেলায় যায়নি। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি নিয়মের হাতে বন্দি। ক্লাস-পরীক্ষা দিতে দিতে এরা তিন মাসের সেমিস্টারে নোট আর হ্যান্ডআউটের বাইরে যাওয়ার সময় পায় না। যারা সংবাদপত্র পড়ার ধারণাই হারিয়ে ফেলেছে, তারা পরীক্ষার ঠোঁটোপাস বেস্তনীর বাইরে গিয়ে কীভাবে বইপড়ার জগত প্রবেশ করবে! এভাবেই আমাদের প্রজন্ম জ্ঞানচর্চার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব যারা দেবে, তাদের এমন বইবিমুখ জীবনে সঙ্কয় বেশি থাকার কথা নয়। সুতরাং ভয়ংকর এক ভবিষ্যৎ কি অপেক্ষা করছে না আমাদের জন্য? বিষয়টি নিয়ে নীতিনির্ধারণক মহলের ভাবনা সম্প্রসারিত হলেই মঙ্গল।